গল্প:

জীবন বাজি

হায়ারে ফুটবল খেলতে গেল পিয়াল, জাকির ও স্বপন। পাশের কলোনি থেকে ফরহাদ এসে তাদের নিয়ে গেল। এলাকা থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে। দুটি দলই ছিল শক্তিশালী। প্রতিপক্ষ ছিল স্থানীয় একটি টাইগার্স ক্লাব। নাউলি টাইগার্স ক্লাব। ওই ক্লাবের সদস্যদের কর্মকান্ড সম্পর্কে সবাই মোটামুটি অবগত। খুবই দুঃসাহসিক ও বিপজ্জনক বললেই চলে। অর্থাৎ গায়ের জোর বা রংবাজিতে তাদের অনেক সুনাম রয়েছে। খেলার মাঠে যে তারা গ্যাঞ্জাম করবে না তাও নিশ্চিত নয়। জেনে শুনে ফরহাদের দল কেন যে খেলতে গেল? অনেকেরই প্রশ্ন জাগলো। তবে স্থানীয় হিসেবে উভয় ক্লাবের মধ্যেই সুসম্পর্ক ছিল।

ফরহাদের দলে তিনজন বাদে বাকি সব খেলোয়াড়ই ছিল অস্থানীয়, মানে অন্য জেলার। বাবা বা ভাইয়ের চাকরির সূত্র ধরেই ওইখানে তাদের বসবাস। কাজেই ভয়ে-নির্ভয়ে সবাই মোটামুটি মানসিক ও শারীরিক প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নামলো। খেলা শুরু হলো এবং খেলার প্রথমার্ধে রেজাল্ট ছিল ১-১। তবে একটা বিতর্কিত প্যানাল্টি ছিল, যা টাইগার্স ক্লাবের খেলোয়াড়দের অভিযোগের ভিত্তিতে বাতিল করা হয়েছিল।

প্রথম থেকেই খেলা ছিল আক্রমণাত্মক এবং পিয়ালের প্রতি টাইগার্স ক্লাবের সমর্থকরা ছিল ঈর্ষান্বিত। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হলো। রেফারি মাত্র বাশিতে ফু দিলেন। পিয়াল সেন্টার থেকে মাঠের বাম পাশ দিয়ে সবার চোখে তাক লাগিয়ে বলটা টেনে নিয়ে একদম জালের ভেতর প্রবেশ করিয়ে দিল। গোলকিপারও বুঝে উঠতে পারেনি যে কি হতে কি হলো। দর্শকরাও ছিল অপ্রস্তুত। কাজেই গোল হওয়া মাত্র দর্শক সারি থেকে কয়েজন উত্তেজিত সমর্থক ধর ধর বলে ছুটে গেল পিয়ালের দিকে। জাকির ও স্বপনের কণ্ঠে ভেসে উঠলো পিয়াল ভাগ। তারাও দৌড় দিল। দৌড়াতে দৌড়াতে তিনজন তিন দিকে হারিয়ে গেল।

পিয়াল ছুটতে ছুটতে বনজঙ্গল ক্ষেতখামার পেরিয়ে একটি ভাঙা বাড়ির দেয়াল পেরিয়ে ঝাপিয়ে পড়লো ভেতরে। জড়সড় হয়ে দেয়ালের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখলো। চুপচাপ বসে ছিল অনেকক্ষণ। দৌড়াতে দৌড়াতে হাপিয়ে গেল। পেছনে আর তাকানোর সুযোগ পায়নি। একই গতিতে প্রায় দুই কিলোমিটার দৌড়ে গেল এবং পথ হারিয়ে একটি অচেনা জায়গায় গিয়ে পড়লো। আড়ালে বসে একটু দম নিল। তারপর পাশে পড়ে থাকা একটি পরিত্যক্ত ভাঙা আয়না কুড়িয়ে নিয়ে দেয়ালের ওপর দিয়ে প্রতিবিম্বের মাধ্যমে অন্য পাশে দেখার চষ্টা করলো। কাউকে দেখতে পায়নি। তবুও সতর্কতার সঙ্গে আবার দেয়ালের ওপর দিয়ে উকি দিল। শত্রু তো দূরের কথা, মাথা তুলেই চমকে উঠলো। শরীরে কাপুনি এসে পশম দাড়িয়ে গেল। বিশ্রী ও ভয়ানক

জায়গা। জঙ্গল ছাড়া কিছুই নেই। নিচে মাটির দিকে তাকানো মাত্র শরীরটা রি রি করে উঠলো। কারণ যে পথে সে এসেছিল সেই পথ ছিল জঙ্গল বোঝাই নোংরা নর্দমা, চলার অনুপযুক্ত। পরিস্থিতি দেখে বের হওয়ার সহজ কোনো রাস্তা ছিল বলে মনে হয়নি। তবুও রাস্তা খুজে বের করতে হবে। পিয়াল ওঠে দাড়ালো। এমন সময় হঠাৎ একটি কান্নার আওয়াজ শুনতে পেল। আওয়াজ শুনেই কোনোদিকে না তাকিয়ে আচমকা বসে পড়লো। ভয় পেয়ে বুকে ফু দিতে লাগলো। এটা কোনো ভূতুড়ে বাড়ি নয় তো? সে আশপাশে তাকিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করলো। আবারো কান্নার আওয়াজ ভেসে এলো। খুবই করুণ কান্না। বিপদাতঙ্কে মানুষ যেভাবে কাদে। তবে ভূতরাও নাকি এভাবে কাদে, অর্থাৎ চিকন কণ্ঠে প্রেতাত্মার বিরহ কান্না।

এবার শোরগোল পাকানো মেয়েলি কণ্ঠ ভেসে এলো। কিন্তু কারণটা কি? ভেবে কিছুই পায়নি। আবার চারদিকে তাকালো। বিশ্বাস করতে পারেনি যে, এ রকম একটা ভাঙা বাড়িতে মানুষের অস্তিত্ব থাকতে পারে। নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা আছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে আওয়াজটা যেদিক থেকে আসছিল ঠিক সেদিকে সে কচ্ছপ গতিতে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল। রুমের কাছে গিয়ে যখন উকি মারার চেষ্টা করলো তখন নির্দয় নির্যাতনের শব্দ শুনতে পেল। কে বা কারা কাকে যেন মারধর করছে। অকথ্য ভাষায় গালাগাল করছে। তবে সবই ছিল নারী কণ্ঠ।

ব্যাপারটা খুব সুবিধার মনে হয়নি। ধরা পড়লে তাকেও হয়তো এমন নির্যাতনের শিকার হতে হবে। কিন্তু বিষয়টা কি, প্রথমে বুঝতে হবে। কেনই বা মারধর করছে? তাছাড়া তারা সবাই মেয়ে মানুষ। পুরুষ হলে হয়তো কোনো না কোনো ক্রাইম বোঝা যেত, পিয়াল ভাবছিল।

ঝোপঝাড়ের ভেতরে বেশি সময় লুকিয়ে থাকা নিরাপদ নয় ভেবে পিয়াল বের হওয়ার পথ খুজছিল। এমন সময় বিল্ডিংয়ের ফাক দিয়ে কয়েকটি মেয়ের পদচারণ লক্ষ্য করলো। বেশভূষা নোংরা টাইপের। গায়ে কোনো ওড়না-ই নেই। টিভিতে দেখা পতিতালয়ের সঙ্গে কিছুটা মিলে যাচ্ছিল। ভাবতেই গা ছমছম করে উঠলো।

কিন্তু মেয়েটিকে নির্যাতন করছে কেন? হঠাৎ তার মনে হলো বেতের বাড়ি দেয়ার সময় তারা বলছিল 'মাগি তুই কাম করবি না ক্যান ক, তোরে টেহা দিয়া কিইন্যা রাখছি, হেই টেহা দিব কেডায়...'। চৈতন্য ফিরে এলো পিয়ালের। থর থর করে কাপতে লাগলো সে। যেভাবেই হোক বেরিয়ে পড়তে হবে। কোনো পথ খুজে না পেলে যে পথ দিয়ে এসেছে সেই পথ দিয়েই বের হবে সিদ্ধান্ত নিল। পায়ে বুট, গায়ে জার্সি। সর্ট প্যান্ট ও জার্সি বারবার জঙ্গলে কাটার সঙ্গে বিধে যাচ্ছিল।

পতিতালয় সাধারণত নদীর পাড়ে হয়ে থাকে। মংলা পোর্টে পিকনিক করতে গিয়ে পিয়াল জেনেছিল। সে হিসেবে এলাকার পাশ দিয়ে ধেয়ে যাওয়া শাখা নদীটা নিশ্চয়ই পতিতালয়ের কাছে। ভেবে স্বস্তি পেল। তাহলে রাস্তা পেতেও অসুবিধা হবে না ভেবে দেয়াল টপকে পার হওয়ার

চেষ্টা করলো। দেয়ালের ওপর হাত রেখে ডান পা তুলে যখন উঠার জন্য শক্তি প্রয়োগ করলো তখন বুট ফসকে নিচে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। এ অবস্থায় সাট করে লোহার অ্যাঙ্গেলটা ধরে ফেললো। তাতে নিচে পড়ে না গেলেও ওপরে উঠতে খুব কষ্ট হয়েছিল। কারণ দেয়ালের সঙ্গে আঘাত লেগে বুকের ডান পাশে ব্যথা পেয়েছে। কঠিন ব্যথা দম বন্ধ হয়ে যায় যায় অবস্থা। তবুও অনেক কষ্টে দেয়াল পার হলো। পা যখন ফসকে গিয়েছিল তখন বিল্ডিংয়ের ভেতর থেকে খসখস আওয়াজ আসছিল। বোধহয় কেউ দেখে ফেলেছে। চেচামেচি করার আগেই বা হাত দিয়ে বগল বরাবর নিচে চেপে ধরে দম খিচে দে দৌড়।

আবার ওই পথে পশ্চিম দিক বরাবর সাবধানে হেটে গেল এবং রাস্তা খুজে বের করলো। সামনে ছিল স্থানীয় বাজার। ওই ছেলেরা হয়তো বাজারে আবার ধাওয়া করতে পারে, তাই ঝুকি না নিয়ে সে বিপরীত দিকে হাটতে লাগলো। যেতে যেতে এক বৃদ্ধ লোকের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি রাস্তা দেখিয়ে দিলেন। সেই অনুযায়ী সে নদীর পাড়ে পৌছে গেল। সেখান থেকে নৌকাযোগে নদী পার হয়ে নিজের এলাকায় ফিরে গেল।

পতিতালয়ে একটি অসহায় মেয়েকে আটকে রেখে নির্যাতন করা হচ্ছে– এ দৃশ্য সে কিছুতেই মন থেকে মুছতে পারেনি। উঠতে, বসতে, পড়তে, ঘুমাতে সারাক্ষণ তার সেই কথাই মনে পড়তে লাগলো। একটা অস্থিরতার মধ্যে তার সময় যাচ্ছিল। সরাসরি কাউকে বলতেও পারছিল না।

বন্ধুদের আড্ডায় যখন কথা হচ্ছিল, তখন তার দৌড়ে পালানোর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে পতিতালয়ে বন্দি মেয়েটির কথা উঠে এলো। ব্যাপারটা সিনেমার কাহিনীর মতোই সবাই মোটামুটি মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। কিন্তু পিয়াল যা ভাবছিল, অন্যরা ব্যাপারটা ঠিক সেভাবে গ্রহণ করেনি। বিষয়টা তারা খুব হাল্কাভাবে নিল। কেউ কেউ আবার ফোড়ন কাটলো ব্যাটা চুনোপুটি, হিরো হতে চায়। মেয়ে মানুষ উদ্ধারে এতো সখ কেন? বাংলা নায়ক হবি নাকি? ওদের টিটকারি, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সব হজম করে নিল। কিছুই বলেনি। হেসে উড়িয়ে দিল। এ নিয়ে বাহ্যিকভাবে আর তেমন কোনো আগ্রহ দেখায়নি।

আলোচনা-সমালোচনার রেশ কেটে যাওয়ার পর পিয়াল চুপচাপ ক্লাবঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মনের অবস্থা কাউকেই বুঝতে দেয়নি। তার মাথা ওই একই চিন্তা মেয়েটিকে বাচাতে হবে। বন্ধুদের সাড়া না পেয়ে খুজে বের করলো সোহেলকে। সোহেলের বাবা হলেন এলাকার একজন প্রতাপশালী ও ক্ষমতাধর ব্যক্তি। তিনি বাজার কমিটির সভাপতি। সোহেল পিয়ালের ক্লাসমেট। সে সোহেলের কাছে গিয়ে পুরো ঘটনা খুলে বললো। সোহেলও অন্যদের মতো শুনে মজা পাচ্ছিল। কিন্তু যখনই তাকে উদ্ধারের কথা এলো, অমনি তারও ভ্রূ কুচকে গেল। এতো বড় একটা জটিল কাজ, একদম অসম্ভব। সোহেল অপারগতা প্রকাশ করলো। বাজারের লোকজন তাকে চেনে। এ ধরনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত শুনলে তার বাবা আস্ত রাখবেন না– সোহেল জানালো। তবুও পিয়াল নিরাশ হয়নি। সোহেলকে বোঝানোর চেষ্টা করলো। না পেরে সব শেষে

ট্রাম্পকার্ডটা ছেড়ে দিল মনে কর, ওই মেয়েটি তোর বোন, তুই কি করবি কর। তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমি চললাম। বিকালে ফোন করবো।

পিয়াল চলে গেল। সোহেল প্রথমে হালকাভাবে নিলেও আস্তে আস্তে বিষয়টা তার গভীরে প্রবেশ করলো। পিয়ালের শেষ কথাটা তার মনে বারবার প্রতিধ্বনি হতে লাগলো। কিন্তু অতোবড় কঠিন কাজ কি করে করবে? এতে জীবনের ঝুকি আছে। বাবার সহযোগিতা নেবে, কিভাবে তা প্রকাশ করবে? বয়সটাও পরিপক্ব নয়। তিনি হয়তো ভাববেন ছেলে নষ্ট হয়ে গেছে, পতিতালয়ে তার যাওয়া-আসা চলে ধ্যাত, কি সব ভাবনা নিজের মাথায় হাতের তালু দিয়ে আঘাত করলো সে। হিসাব মেলাতে ব্যর্থ হলো। না, না, বাবাকে বলা যাবে না– সোহেল চমকে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে পিয়ালকে ফোন করলো।

পিয়াল আসার পর দু'জনে মিলে নিজের কামরায় গিয়ে দরজা বন্ধ করে প্লান করতে লাগলো। কিন্তু মাথায় আসছিল না যে, কিভাবে মিশন শুরু করবে।

বেলা গড়িয়ে বিকাল হতে চললো। এমন সময় কাউকে কিছু না বলে তারা দু'জন বাসা থেকে বেরিয়ে গেল। খুজে বের করলো স্থানীয় দুই বখাটে হেরোইন্সি পিন্টু ও কুদ্দুসকে। তারা নাকি পতিতাপল্লীর হিরো। সোহেলকে খুব মানে এবং সে যা নির্দেশ করবে তারা তাই-ই মানতে বাধ্য।

পিয়াল তার আইডিয়া অনুযায়ী মেয়েটির লোকেশন বুঝিয়ে দিল। কুদ্দুস সহজেই খুজে বের করার নিশ্চয়তা দিল। তবে সঙ্গে আব্বাসকে নিতে হবে বলে জানালো। তার কথা মতো আব্বাসকে দলে নিয়ে পাচজনে বসে পরামর্শ করার পর রাত ৯টায় তাদের মিশন শুরু হলো। সোহেল টাকার জোগান দিল। যাওয়ার সময় তারা বাজার থেকে দুটি কালো খেলনা পিস্তল কিনে নিল। সর্দারনীকে ম্যানেজ করে তারা পাশাপাশি তিনটা রুম ভাড়া নিল। রাত তখন গভীর। চারদিকে নীরব। নদীর অভিমুখে গহীন জঙ্গল। ঝিঝি পোকা ডাকছে। মাঝে মধ্যে কোনো কোনো রুমের বাতি জ্বলতে এবং নিভতে দেখা গেছে।

মাঝের রুমে অর্থাৎ যেই রুমটিতে মেয়েটি অবস্থান করছিল ঠিক সেই রুমটি নিল আব্বাস। তার বিনিময়ে সর্দারনীকে একটু বেশি পয়সাই দিতে হয়েছে। পাশের দুই রুমে পিন্টু ও কুদ্দুস। আব্বাস প্রথমে ঢুকেই মেয়েটিকে অভয় দিল এবং সব ঘটনা খুলে বললো। মেয়েটির নাম রুকু।

কুদ্দুস যে রুমে ছিল সেই রুম থেকে রাত দেড়টার সময় মোবাইল সঙ্কেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আব্বাস গিয়ে প্রবেশ করলো। সঙ্গে সঙ্গে কুদ্দুস জাপটে ধরলো পতিতা মেয়েটিকে এবং দু'জনে মিলে তার হাত পা মুখ বেধে ফেললো। মেয়েটি চিৎকার করার চেষ্টা করলে কুদ্দুস পিস্তল ঠেকিয়ে দিল এবং বাট দিয়ে ঘাড়ে একটা আঘাত করলো। তারপর খুব সাবধানে তারা পাশের কামরায় গিয়ে প্রবেশ করলো। ওই রুমের পতিতা মেয়েটি তখন ঘুমের ভাব ধরে একপাশে কাত

হয়ে শুয়ে ছিল । আব্বাস ও কুদ্দুস রুমে ঢুকেই তার ওড়না ও জামা কাপড় দিয়ে হাত পা মুখ বেধে ফেললো । সে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করলে কুদ্দুস খেলনা পিস্তল দিয়ে তাকেও আঘাত করলো । আঘাতের পরও সে মুখের কাপড় সরানোর চেষ্টা করলো । আব্বাস তার অস্থিরতা দেখে কষে একটা চড় মারলো । চড় খেয়ে সে ব্যথিত না হয়ে বরং মাথা নেড়ে পজিটিভ ইঙ্গিত করলো । আব্বাস আবার হাত তুললো । কিন্তু সে মাথা নেড়ে মানা করলো । তার ইঙ্গিতে স্থির হয়ে আব্বাস হাত নামিয়ে নিল । সে যে কিছু একটা বলতে চাচ্ছে আব্বাস বুঝতে পারলো । এমনকি মাথা নেড়ে চিৎকার না করার প্রতিশ্রুতি দিল । পরে তার বন্ধ মুখ আংশিক খুলে দেয়া হলো ।

" আমাকে ভুল বোঝ না । আমি তোমাদের সাধুবাদ জানাই । তোমরা একটি নির্দোষ মেয়ের জীবন বাচাতে এসেছো, আমি জানি । আমি তো শেষ হয়েই গেছি । তবুও তার ওপর নির্যাতন দেখে আমার খুব মায়া হলো । এমন নির্যাতন এক সময় আমাকেও সইতে হয়েছে । কিন্তু সেদিন কেউ আমাকে বাচাতে আসেনি । ওই মেয়েটিকে বাচাতে তবুও তোমরা এসেছো । আমি চাই তোমরা সফল হও । তবে আমাকে ভালোমতো বেধে যাও, প্রয়োজনে এই কপালটায় একটা আঘাত করে যাও, যেন দূষিত রক্ত গড়িয়ে পড়ে । যাতে সকাল হলে বলতে পারি যে, ডাকাত পড়েছিল । আর শোন, তোমরা কোন পথে বের হবে নিশ্চয়ই জানো । কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, এই পল্লীতে কখনো নতুন মেয়ে এলে তার নিরাপত্তার জন্য পেছন দিকের রাস্তায় পাহারাদার থাকে । এখনো আছে, সাবধানে যেও । "

তার কথা শুনে আব্বাসের মানবতাবোধ জেগে উঠলো । আব্বাস মেয়েটির নেকাবটা বাধতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো তাদের সঙ্গে যাবে কি না । মেয়েটি রাজি হয়নি । এতো কথা শোনার সময় নেই বললো পিন্টু । কাজেই তড়িঘড়ি তার কথামতো হাত-পা বেধে রেখে বেরিয়ে গেল । মেয়েটি তখন কাদছিল ।

ছুটে গেল রুকুর রুমে । কালক্ষেপণ না করে রুকুকে নিয়ে বারান্দা দিয়ে নখ টিপেটিপে দৌড়ে বেরিয়ে গেল ।

জীবনের ঝুকি নিয়ে তারা পতিতাপল্লীর পেছনে ঝোপজঙ্গলের পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো । রওনা হওয়ার সময় কুদ্দুস ওড়না দিয়ে রুকুর মুখটা বেধে দিল । মেয়েরা একটু ভীতুই হয় । সামান্য তেলাপোকা দেখলেই আউ করে চিৎকার দিয়ে ওঠে । ঝুকিপূর্ণ জঙ্গল পথে বের হতে গেলে আরো ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে । তাছাড়া সামান্য হোচট খেলেও মেয়েরা কাই করে ওঠে । কাজেই মেয়েদের নিয়ে পথ চলা মানে বিপদ ডেকে আনা– ওড়না পেচাতে পেচাতে কুদ্দুস স্মরণ করিয়ে দিল ।

আব্বাস রুকুকে নিয়ে পেছন পেছন যাচ্ছিল । সামনে কুদ্দুস ও পিন্টু । খুব সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে লাগলো । হঠাৎ রুকু চমকে উঠলো । পা উচু করে দাড়িয়ে গেল । আব্বাস অনেকটা জোর করেই তাকে টেনে নিয়ে গেল । পিন্টু ও কুদ্দুস হাত দিয়ে ইশারা করতে করতে সামনের দিকে এগিয়ে চললো । ইশারা অনুযায়ী আব্বাস এবং রুকুও এগিয়ে যেতে লাগলো । হঠাৎ

টর্চের আলো। কে যেন লাইট মারলো। আলো দেখেই সবাই চুপচাপ বসে পড়লো। কিছুক্ষণ নীরব। যাকে বলে পিনপতন নীরবতা। সবাই থর থর করে কাপছিল। শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত চলছিল। আতঙ্কে রুকুর পা থেমে যাচ্ছিলো। কুদ্দুস আগে আগে যেতে লাগলো। তার আবার সাহস বেশি। জীবনকে শুধু ডাইল-ই মনে করে।

" চুপ, কে যেন ম্যাচের কাঠি ধরালো "– কুদ্দুস বললো। কাঠি জ্বালানো বারুদের গন্ধ পেল কুদ্দুস। নিশ্চয়ই কোনো পাহারাদার হবে। লোকের অবস্থান বুঝতে পেরে সে একটা আধলা ইট হাতে নিল। আস্তে আস্তে দেয়ালের গা ঘেষে গিয়ে অতর্কিতে আঘাত করলো তার মাথায়। উহ, বলার আগেই চেপে ধরলো তার মুখ। আরেক হাতে খেলনা পিস্তল ঠেকিয়ে দিল– শব্দ করলে একদম শেষ। তড়িঘড়ি পিন্টু গিয়ে ওই লোকের গায়ের জামা ও লুঙ্গি খুলে মুখ-হাত-পা বেধে ফেললো। এই ফাকে আব্বাস রুকুকে নিয়ে সামনের রাস্তা দিয়ে ভো দৌড়। সামনে পড়লো প্রাচীর। এক লাফে আব্বাস প্রাচীরে উঠে গেল। পেছন থেকে পিন্টু ও কুদ্দুস এসে রুকুকে শূন্যের ওপর তুলে ধরলো।

প্রাচীর পেরিয়ে দে ছুট। এক পর্যায়ে দম ফেলতে কষ্ট হচ্ছে বিধায় রুকু নিজেই তার মুখের বাধন খুলে ফেললো। কিছুদূর ছুটার পর মোটামুটি নিরাপদ মনে করে স্বস্তি পেল। রুকু ধপাস করে বসে পড়লো একটি আমগাছের নিচে। প্রচ- বেগে হাপাতে লাগলো এবং যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগলো। তার পায়ে কোনো জুতা ছিল না। কেটে গেছে অনেকখানি। কাজেই নিজের ওড়না ছিড়েই পা বেধে নিল। তখনো রক্ত ঝরছিল। হয়তো পুরো পথেই রক্তের দাগ লেগে আছে। সমস্যা নেই। রাতের বেলা, রক্তের দাগ কেউ দেখবে না– আব্বাস বললো।

গাছের নিচে বসেই পিন্টু সোহেলকে ফোন করলো। সোহেল ফোনে তাদের অবস্থান জানালো এবং লোকেশন অনুযায়ী তারা আবার দ্রুত হেটে চললো। পথ চলতে তখন আর তেমন কোনো অসুবিধা হয়নি। কারণ ওই পথ পিন্টু-কুদ্দুসের বহু পরিচিত। তবে ভয় ছিল সর্বহারাদের। পথে যেতে যদি সামনে পড়ে যায়, তাহলে শেষ।

নদীর পাড়ের পিয়াল, সোহেল ও তাদের আরো দু'জন সহযোগী মিলে নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করছিল। পিন্টুরা গিয়ে রুকুকে সোহেলের হাতে তুলে দিল। সোহেল তাদের পরে দেখা করতে বলে বিদায় দিল।

পিয়াল ও সোহেল নদী পার হয়ে চলে গেল ওপাড়ে। তারপর রুকুর কাছ থেকে তার সম্পূর্ণ পরিচয় জেনে নিয়ে ঠিকানা অনুযায়ী রাতারাতি তাকে বাড়ি পৌছে দেয়ার উদ্দেশে রওনা হলো। বেশি দূরে নয়, ২০ কিলোমিটারের মতো পথ। তবে যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো ছিল না। রাত প্রায় শেষের পথে। আজান হওয়ার পরপরই গ্রামের মানুষের চলাচল শুরু হবে। তখন সোজা পথ দিয়ে না গিয়ে একটু আড়াল-আবডাল হয়ে কৌশল অবলম্বন করেই যেতে হবে। কারণ অতো ভোরে চারটা ছেলের সঙ্গে একটা মেয়ের যাতায়াত গ্রামবাসীর কাছে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। তাছাড়া গ্রামের লোকজন এসব ক্ষেত্রে বেশ সচেতন। এমন আলাপ-আলোচনা করতে করতে তারা

এগিয়ে যেতে লাগলো। প্রতারক প্রেমিকের খপ্পরে পড়ে প্রেমের মাশুল গুনতে হয়েছে– সোহেলের প্রশ্নের জবাবে রুকু জানালো।

প্রায় ভোর হয়ে গেল। চারদিক ফরসা হতে না হতেই তারা পাকা রাস্তা খুজে পেল। রাস্তায় পৌছে মোটামুটি স্বস্তি পেল। দ্রুত পা চালিয়ে যেতে লাগলো। তারপর কিছুদূর ট্যাম্পোতে, কিছুদূর নৌকায় করে সম্পূর্ণ পথ পাড়ি দিয়ে রুকুদের বাড়ি পৌছালো। বাড়িতে ঢুকেই যেন চিৎকার চেচামেচি কান্নাকাটি না হয় তার জন্য সোহেল আগেই রুকুকে বারণ করে দিল। কারণ তাতে লোক জানাজানির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানালো। তবুও কান্না কি আর ধরে রাখা যায়? বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে দ্রুতগতিতে হুমড়ি খেয়ে আঙিনায় প্রবেশ করলো। মা-বাবাকে দেখেই পা জড়িয়ে কেদে উঠলো। তারা তো মেয়েকে পেয়ে যেন হাতে চাদ পেয়েছেন। তবে রুকুকে কোথা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তা গোপন রেখে পাচারকারীদের কথা বলা হয়েছিল। শুনে তার মা-বাবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। মিশনের সবাইকে ছেলের আসনে বসালেন।

রুকুর মায়ের চোখে পানি। রুকু তখন ভীষণভাবে আবেগাপ্লুত। আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ছিল তার গা বেয়ে। বুকের ভেতর হয়তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আরো অনেক ভাষা জমা ছিল। কিন্তু প্রকাশ করতে পারেনি। আবেগ উচ্ছ্বাসে কথাই বলতে পারেনি, যেন এক প্রতিবন্ধী। শেষে কি করবে, উপায় খুজে না পেয়ে তাদের সামনে মাটিতে বসে পড়লো। পাশাপাশি দাড়ানো সোহেল ও পিয়ালের পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেদে উঠলো।

আইয়ুব আহমেদ দুলাল

সউদি আরব থেকে

ayubalibd@hotmail.com